প্রাঃ—ঘটনা ভিত্তিক রবীন্দ্র

সংগীত রচনার তথ্য ঃ সহ আলোচনা কর।

১। 'অনেক কথা যাও যে বলে

কোন কথা না বলে,

রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথের কোন সন্তান ছিল না। সেজন্য তাঁর স্ত্রী প্রতিমা দেবী একটি মেয়েকে দত্তক রেখেছিলেন। মেয়েটির নাম 'নন্দিনী'। ডাক্ নাম 'পুপে', তিনি মেয়েটিকে খুব ছোট অবস্থায় এনেছিলেন। নন্দনী রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি ওকে খুব স্নেহ করতেন। রবীন্দ্রনাথ যখন দুপুরে খাওয়ার পর বিশ্রাম নিতেন তখন আয়ার সাহায্যে নন্দিনী তাঁর কাছে আসত, রবীন্দ্রনাথ এতে খুব খুসী হতেন। তারপর মেয়েটির সঙ্গে নানারকম কথা বলতেন। নন্দিনী কোন কথা বলতে না পারলেও আকার ইঙ্গিতের মাধ্যমে তা রবীন্দ্রনাথকে বুঝিয়ে দিতেন! নন্দিনীর এই অস্ফুট ভাষা শুনে রবীন্দ্রনাথ শিশুটির মনের কথা এই গানটির মাধ্যমে প্রকাশ করলেন। সুতরাং উপরিউক্ত গানটি এই পরিপ্রেক্ষিতে রচিত।

২। "সে কোন বনের হরিণ ছিল আমার মনে"

রবীন্দ্রনাথের নাতি দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর খুব ভালো গান গাইতে পারতেন এবং এস্রাজ বাজাতে পারতেন। দীনেন্দ্রনাথের স্ত্রীর নাম ছিল কমলা দেবী। তাঁর কোন সন্তান ছিল না। সেজন্য তিনি সন্তানের স্পৃহা মেটাবার জন্য একটি হরিণ শাবক সন্তানের মত পুষতেন। এই হরিণ শিশুটিকে তিনি নিজের পুত্রের মতনই স্নেহ করতেন, প্রতিদিন ভোরবেলা তিনি হরিণটিকে ঘাস খাওয়াতেন। তার গলা থেকে শিকল খুলে তাকে নিয়ে সারা মাঠে বেড়াতেন। এই রকম একদিন ভোরবেলা কমলা দেবী হরিণের ঘরে গিয়ে দেখেন হরিণটি শিকল খুলে কোথায় পালিয়ে গেছে। তখন তিনি চীৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ

করলেন। সেই চীৎকারে দীনেন্দ্রনাথ ঘুম থেকে উঠে পড়লেন। দীনেন্দ্রনাথ হরিণটাকে অনেক খুঁজলেন কিন্তু কোথাও তাঁর কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। তারপর দীনেন্দ্রনাথ সকল জায়গায় হরিণটাকে খোঁজার জন্য লোক পাঠালেন। অনেক খোঁজার পর তারা হরিণ শিশুটির সন্ধান পেল। তারা এসে বললেন যে সন্ধ্যাবেলা হরিণটি সাওতাল পল্লীর মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল তখন সাওতালেরা তাকে দেখতে পেয়ে মেরে ফেলেন, এই কথা যখন কমলাদেবী শুনতে পেলেন তখন তিনি পুত্রহারা মাতার মত কেঁদে উঠলেন।

রবীন্দ্রনাথ হরিণটির মৃত্যুর খবর শুনে দীনেন্দ্রনাথের বাড়ীতে এলেন। কমলাদেবী তাঁকে দেখে আরও জোরে কেঁদে তাঁর কোলে মুখ লুকোলেন। রবীন্দ্রনাথ সব শুনে মনে অত্যন্ত ব্যথা পেলেন। তিনি তাঁর মনের ব্যথাটি এই গানটির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করলেন।

(৩) "সর্ব খর্ব তারে দহে তব ক্রোধ"

যতীন্দ্রনাথ দাস ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম নেতা। তখন বাংলার বিপ্লবী এই যতীন দাস ছিলেন জেলে। যতীন দাসের কতকগুলি দাবি ছিল। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ তার এই দাবীগুলি মানতে রাজী ছিলেন না! তখন থেকেই তিনি অনশন শুরু করেন, তখন দেশের সমস্ত লোক তাঁকে অনেক বোঝালেন কিন্তু তিনি সকলের কথা উপেক্ষা করলেন। সেইসময় রবীন্দ্রনাথ 'তপতী' নামে একটি নাটক রচনা করেন তখন শান্তিনিকেতনে সেই নাটকের অভিনয়ের মহড়া চলছিল প্রতিদিন। রবীন্দ্রনাথ পরিচালক হিসাবে রোজ মহড়ায় আসতেন এবং নিজে নাটকটি পাঠ করতেন। রোজই রবীন্দ্রনাথের কাছে খবর আসে যে যতীন দাসের শারিরীক অবস্থা ক্রমশই অবনতি হচ্ছে। একদিন খবর এল যে যতীন্দ্রনাথ মারা গেছেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু সেদিন মহড়া বন্ধ করলেন না। কিন্তু মহড়া দিতে তিনি বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছেন, কিছুক্ষণ পর রবীন্দ্রনাথ মহড়া না দিয়ে বাড়ীতে চলে এলেন। বাড়ীতে এসে তাঁর মনের ক্ষোভ এই গানটির মাধ্যমে প্রকাশ করলেন।

৪। "সময় কারো যে নাই
ওরা চলে দলে দলে"

পূর্বে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন হত। মেয়েরাও এসে অংশগ্রহণ করতেন যেমন চিত্তরঞ্জনের স্ত্রী বাসন্তীদেবী ছিলেন তাদের মধ্যে

অন্যতম। এই সময় রবীন্দ্রনাথ বর্ষামঙ্গল গান রচনা করেছিলেন শান্তিনিকেতনে সেই সময় তিনি শুনতে পেলেন চিত্তরঞ্জনের স্ত্রী বাসন্তীদেবী প্রভৃতি অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ আইন অমান্য করার ফলে গ্রেপ্তার হয়েছেন। তাদের যখন জেলে নিয়ে যাওয়া হয় তখন আন্দোলন আরও বেড়ে গেল। সেই সময় রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি বেনামী চিঠি এল। সেই চিঠিতে একটি লাইন ছিল,

"দেশে যখন আন্দোলন চলছে তখন তুমি গান গেয়ে বেড়াচ্ছ।"

রবীন্দ্রনাথ এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে এই গানটি রচনা করলেন।